রূপান্তর

তারিখ 14 OCT 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন রুখতে হবে

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

উচ্চ শিক্ষাঙ্গন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জায়গা। সম্মানিত শিক্ষকরা এখানে শিক্ষার্থীদের কেবল পাঠদান করেন না; তারা গবেষণা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণও করেন। এ প্রক্রিয়ায় একাডেমিক জগৎ শিক্ষকদের নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এখানেই পার্থক্য। এজন্য বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন দ্বারা পরিচালিত, ওই অধ্যাদেশে শিক্ষকদের দুটি কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এর একটি শিক্ষাদান এবং অন্যটি হল গবেষণা। কাজেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যদি কেবল শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে দায়িত্বপালন শেষ হয়েছে মনে করেন, তাহলে বলা যাবে যে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতির শর্ত হিসেবে গবেষণামূলক প্রকাশনার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের পাশাপাশি গবেষণামূলক লেখালেখি ও প্রকাশনা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আছেন। এ দুটি কাজে অবহেলা করে শিক্ষকতায় টিকে থাকা বা এ পেশায় উন্নতি করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় ভালো ফলাফলধারী সেরা শিক্ষার্থীরা সুযোগ পান। এরা যে নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন নতুন অনুদ্ঘাটিত এলাকায় সৃষ্টিশীল গবেষণা করবেন সেটা স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে কেবল নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনকে সমৃদ্ধ করেন না, তারা সে জ্ঞান তাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন। সারা বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এমন প্রবণতা সক্রিয় থাকলেও বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ ভিন্ন রকম। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়, বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়, একাডেমিক চর্চার চেয়ে রাজনীতির চর্চা বেশি। সে রাজনীতি হল বর্ণের আবরণে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি। এ রাজনীতি বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের একাডেমিক চরিত্র কলুষিত করে দিয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রার্থী কম যোগ্য হয়েও রাজনৈতিক প্রভাব বা অদৃশ্য লেনদেনে শিক্ষক হয়েছেন বলে জানা যায়। টিআইবি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটন করেছে। এসব কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অনেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অবদানমূলক গবেষণা না করে পদোন্নতি পাচ্ছেন। এদের কেউ কেউ নিজে পরিশ্রম করে লেখার চেষ্টা করছেন; আবার অনেকে পদোন্নতির শর্ত পূরণ করতে গিয়ে অন্যের লেখা নকল করে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ছে। তবে এসব একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি (প্লেজারিজম) ধরা পড়লেও সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না।

এ একাডেমিক অসততা বা প্লেজারিজম কী? কেন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এর চর্চা বাড়ছে? কীভাবে এর ব্যবহার কমানো যায়? এ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। প্লেজারিজম বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তা হল, অন্যের লেখা থেকে চুরি করে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দেয়া। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে হলে তো সে বিষয়ে ইতিপূর্বে কী গবেষণা হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্যই খোঁজখবর নিতে হবে। নিজের লেখায় সেসব গবেষণা কাজের উল্লেখ ও পরিচিতি থাকা দোষের নয়। দোষের নয় ওইসব লেখার মূল ভাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও। কিন্তু ওইসব গবেষণা বা লেখার সমগ্র বা কিছু অংশের উদ্ধৃতি না দিয়ে হুবহু নকল করে নিজের লেখা বলে একাডেমিক জগতে চালিয়ে দেয়া গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নারীঘটিত চারিত্রিক অপরাধ করে চাকরি হারানোর উদাহরণ থাকলেও প্লেজারিজম করে চাকরি হারানোর বা কঠোর শাস্তি পাওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ব্যবস্থায় সুশাসন না থাকায় এবং একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির (চাকরিচ্যুত করা, আর্থিক জরিমানা করা ইত্যাদি) উদাহরণ না থাকায় কিছুসংখ্যক শিক্ষক কষ্ট করে গবেষণা না করে অন্যের লেখা থেকে চুরি করে নিজের লেখা হিসেবে চালিয়ে পদোন্নতি নেয়ার অপচেষ্টা করছেন। আর এসব দুর্বল একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক দলীয় স্বার্থগত কারণে তাদের এহেন অপকর্মের পঙ্কে অনেক ক্ষেত্রে একই বর্ণদলীয় কিছু শিক্ষকের সহায়তা পাচ্ছেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেজারিজম কমছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষ প্লেজারিজম ধরা পড়লে দোষীদের যে শাস্তি দিচ্ছে না এমন নয়। যেমন, এ বছর এমন অপরাধ করায় বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপককে পদাবনতি ঘটিয়ে ঢাবি কর্তৃপক্ষ তাকে ২ বছর কোনো পদোন্নতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরবি বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক পিএইচডি গবেষণায় নকল করায় তাকেও পদাবনতি দেয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে যে রকম শাস্তি দেয়া হচ্ছে— সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সুশাসনের চর্চা প্রত্যাশীরা তাকে পর্যাপ্ত মনে করছেন না।

> বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে নকলপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণ কী? এর একটি কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাভিত্তিক নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে না পারা। অনেকে প্রত্যাশিত যোগ্যতা না নিয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। এদের অনেকে গবেষণার চেয়ে অর্থ উপার্জনে বেশি মনোযোগী। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গবেষণায় মনোযোগী না হয়ে কোনো কোনো সম্মানিত শিক্ষক অধিকতর মনোযোগী হচ্ছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান, কনসালটেন্সি, হেকেপসহ অন্যান্য প্রজেক্ট এবং সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামে পাঠদানের প্রতি। এতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটলেও শিক্ষকদের একাডেমিক চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজকর্ম কমে যাচ্ছে। কিন্তু পদোন্নতির জন্য তো প্রকাশনা দরকার। আর স্বল্প সময়ে সে প্রকাশনা তৈরি করতে শিক্ষকদের কেউ কেউ প্লেজারিজমের আশ্রয় নিয়ে দ্রুত পদোন্নতি পেতে চাইছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে নকলপ্রবণতা বলতে সাধারণ মানুষ এক সময় পরীক্ষায় নকল করাকে বুঝতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে প্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শুরু হয় ডিজিটাল কারচুপি। এ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার্থীকে হলের বাইরে থেকে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিবাজরা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের উত্তর বলে দিত। কয়েক বছর কড়াকড়ি করে এ দুর্নীতিও সম্প্রতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এভাবে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও শিক্ষকদের অসততা ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয়নি। একদিকে শিক্ষকদের কেউ কেউ যেমন নারীঘটিত চারিত্রিক দুর্নীতিতে জড়িত হচ্ছেন; আবার অন্যদিকে কিছুসংখ্যক শিক্ষককে জড়িত পাওয়া যাচ্ছে একাডেমিক চৌর্যবৃত্তিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্লেজারিজমের চর্চা বাড়ছে।

একাডেমিক চৌর্যবৃত্তির মধ্যে নকল করে থিসিস লেখা এবং অন্যের গবেষণাকর্ম থেকে চুরি করে উদ্ধৃতি না দিয়ে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দেয়ার ঘটনা বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকদের কেউ কেউ পদোন্নতির জন্য যেসব প্রকাশনা জমা দিচ্ছেন তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অন্যের লেখা থেকে নকল করা লেখা পাওয়া যাচ্ছে। এরকম একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি প্রায়ই ধরা পড়ছে। আবার অনেকে এমন চুরি করে ধরা না পড়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। এর একটি কারণ হল, যাদের কাছে এসব প্রকাশনা মূল্যায়ন করতে দেয়া হচ্ছে তাদের অনেকে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের পর্যাপ্ত লেখাপড়া জানা ব্যক্তিত্ব না হওয়ায় সহজে এ চৌর্যবৃত্তি ধরতে পারছেন না। উল্লেখ্য, লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। তবে এখন প্লেজারিজম শনাক্ত করার জন্য প্লেজারিজম ডিটেকটর সফটওয়্যার কিনতে পাওয়া যায়। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি শনাক্ত করা যায়। যেহেতু বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি বাড়ছে, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত হবে প্লেজারিজম নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত সফটওয়্যার ব্যবহার করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন রোধে এরকম সফটওয়্যার ক্রয় করে ব্যবহার করছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও উচিত হবে এমন সফটওয়্যার ক্রয় করে অনুষদভিত্তিক জার্নালগুলোতে জমা পড়া লেখাগুলোতে প্লেজারিজম হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। ইউজিসির যদি প্লেজারিজম নিয়ে মাথাব্যথা থাকে, তাহলে এ সংস্থাটি সব বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে একটি জরুরি নির্দেশনা দিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে নকলপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণ কী? এর একটি কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাভিত্তিক নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে না পারা। অনেকে প্রত্যাশিত যোগ্যতা না নিয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। এদের অনেকে গবেষণার চেয়ে অর্থ উপার্জনে বেশি মনোযোগী। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গবেষণায় মনোযোগী না হয়ে কোনো কোনো সম্মানিত শিক্ষক অধিকতর মনোযোগী হচ্ছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান, কনসালটেন্সি, হেকেপসহ অন্যান্য প্রজেক্ট এবং সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামে পাঠদানের প্রতি। এতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটলেও শিক্ষকদের একাডেমিক চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজকর্ম কমে যাচ্ছে। কিন্তু পদোন্নতির জন্য তো প্রকাশনা দরকার। আর স্বল্প সময়ে সে প্রকাশনা তৈরি করতে শিক্ষকদের কেউ কেউ প্লেজারিজমের আশ্রয় নিয়ে দ্রুত পদোন্নতি পেতে চাইছেন।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাদের লেখায় প্লেজারিজমের আশ্রয় নেয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ঢাবি সিন্ডিকেট সূত্রে জানা যায়, এদের দু'জনের বিরুদ্ধে শিকাগো জার্নাল প্রেরিত অভিযোগে তাদের লেখায় খ্যাতিমান দার্শনিক মিশেল ফুকোর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড পাওয়ার' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নকলের অভিযোগ আনা হয়েছে। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে আরেকটি লেখায় সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সাইদের লেখা থেকে নকল করার (বাংলা ট্রিবিউন, ৩০.০৯.১৭)। অন্য তিনজন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও রয়েছে তাদের প্রকাশনায় সুনির্দিষ্ট প্লেজারিজমের লিখিত অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. নাসরীন আহমাদকে প্রধান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জগন্নাথ, কুষ্টিয়াসহ আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় প্লেজারিজমের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং তদন্তের মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় দোষীদের শাস্তি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যাপারে প্রশংসনীয় কাজ করে। শিক্ষক নিয়োগে সুশাসন ও পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও ঢাবি কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের নৈতিক স্খলনের ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়টির প্রশংসা করা যায়। শিক্ষকদের নারীঘটিত কেলেংকারির ব্যাপারে এ বিশ্ববিদ্যালয় দোষীদের ছাড় দেয় না। এ ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুতির মতো কঠোর শাস্তির অনেক উদাহরণ রয়েছে। তবে প্লেজারিজমের প্রমাণিত অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে ঢাবির শাস্তির নমুনা এতটা কঠোর নয়। বিভিন্ন সময় সংঘটিত প্লেজারিজমের জন্য প্রদত্ত শাস্তির নমুনা জরিপ করে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি পদাবনতি পর্যন্ত। শিক্ষাবিদদের অনেকে মনে করেন, চারিত্রিক স্খলনের শাস্তির মতো একাডেমিক দুর্বৃত্তায়নের শাস্তিও কঠোর হওয়া উচিত। শিক্ষাঙ্গনে সুশাসন প্রত্যাশীদের বিশ্বাস, প্রকাশনায় প্লেজারিজমের আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগ তদন্তে গঠিতব্য কমিটির সম্মানিত সদস্যরা দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করবেন। তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ হলে তারা অপরাধীদের জন্য এমন শাস্তির সুপারিশ করবেন, যা দেখে নবীন শিক্ষকরা প্লেজারিজম পরিহার করে সততার সঙ্গে গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করবেন।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com